প্রকৃত শিক্ষা হৃদয় ও বোধকে শুদ্ধ করে

এই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। লন্ডনের অভিজাত জীবন ছেড়ে ভারতে আসতে হয় তাঁকে। তার পর এ দেশের শিক্ষা সংস্কারের কাজে বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর আগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো নিয়ে কারও আগ্রহ ছিল না। হাজার উপহাস সহ্য করেও প্রসারিত করেছেন নারীশিক্ষার ক্ষেত্র। আগামী কাল জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ভারতে পদার্পণ ১৭৫তম বর্ষে পড়বে। কৃষ্ণা রায়

উনিশ শতকের লন্ডন। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তিনি তখন অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। অভিজাত এই ব্রিটিশ একাধারে আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ, গণিতজ্ঞ। তা ছাড়াও, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রাশিবিজ্ঞানে তাঁর অনায়াস যাতায়াত। অসংখ্য বিষয়ের উপর বইও লিখেছেন তিনি। সেলেব্রিটির জীবন তাঁর। এমন অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের অনুরোধ মোটেই খুশি করতে পারল না তাঁকে। লন্ডন ছেড়ে যেতে হবে কলেরা, আমাশা, ম্যালেরিয়ার স্বর্গরাজ্য ভারতে। সেখানে বড়লাটের আইন-সচিবের পদ তাঁর জন্য অপেক্ষারত। তাঁর আগে লর্ড মেকলে এ দেশে যে সব আইনি সংস্কার অসমাপ্ত রেখেছিলেন, সে সব আইনি খসড়ার পরিপূর্ণ রূপ দিতে হবে তাঁকে। খুশি না হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুরোধ ফেরালেন না তিনি।

সময়টা ১৮৪৮ সালের ১১ এপ্রিল। ভরা গ্রীষ্মের কলকাতায় পা রেখেছিলেন সাতচল্লিশ বছর বয়সি যে অনিচ্ছুক মানুষটি, তাঁর নাম জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, সংক্ষেপে বেথুন সাহেব। সে দিন তিনি নিজেও হয়তো জানতেন না, আইনি উপদেষ্টা হওয়া ছাড়াও এই অপরিচিত দেশে তিনিই গড়ে তুলবেন নারীশিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ বছর তাঁর ভারতে আগমন ১৭৫তম বছরে পড়ল।

ভারতে আসার বহু আগে বেথুন সাহেব এ দেশের অসহায় মেয়েদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর মানবতাবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রবর্তিত সতীদাহ-প্রথা নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন সমকালের বিশিষ্ট সমাজপতি রাধাকান্ত দেব ও তাঁর অনুগামীরা। ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলে সে মামলায় রাধাকান্ত দেবের পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন ব্যারিস্টার জন এলিয়ট। মামলায় তিনি হেরে যান। সে দিন জন এলিয়টের জীবনে এ মামলা ছিল আর পাঁচটা মামলার মতোই, ভারতীয় নারীদের জীবন, সমাজশাসকদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা ছিল না তাঁর। পরে এই মামলায় ভুল পক্ষে সওয়াল করার জন্য তিনি বহু আক্ষেপ-অনুতাপ করেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন ভারতে নারীশিক্ষা একটুও প্রাধান্য পায়নি। ১৮০৫ সালে লর্ড মেকলের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবেও নারীশিক্ষা বিষয়ে কিছুই ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ তিন বছর চার মাস ভারত-বাসকালে বাংলার নিরক্ষর মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ভাবে তৎপর হয়েছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার। ভারতে আসার এক মাসের মধ্যেই বড়লাট লর্ড ডালহৌসির আদেশে তিনি সারা ভারতের শিক্ষা সংসদের সভাপতি হন। আর সেই অধিকারে নারীশিক্ষা তো বটেই, একান্ত আন্তরিকতায় ভারতের যুবসমাজকেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছেন তিনি। এর প্রমাণ আছে কৃষ্ণনগর, ঢাকা, হুগলি, হিন্দু কলেজ পরিদর্শনকালে এবং ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (এখনকার বেথুন স্কুল) উদ্বোধনকালে দেওয়া তাঁর একাধিক ভাষণে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রক্ষণশীল বাঙালি জনমানস তখনও ঘরের মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবেনি। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল তৈরি হলেও সেখানে ধর্মান্তরিত আশঙ্কা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে বাঙালি মেয়েদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ ঘটনা। অনেক অসম্মান, অসঙ্গত অপবাদকে অবহেলায় উপেক্ষা করে তাঁর স্কটিশ রক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের যাত্রাপথকে গতিময় করেছে। সমাজপতিরা নানা ভাবে বাধা দিয়েছেন, বেথুন সাহেব নিজের প্রকল্পে অটল থেকে গিয়েছেন।

ইংল্যান্ডে থাকতেই, বেথুন সাহেব যুক্ত হয়েছিলেন হুইগ পার্টির সাংসদ লর্ড চ্যাপেলর হেনরি ব্রুহ্যামের গড়ে তোলা 'সোসাইটি ফর দ্য ডিফিউশন অব ইউজফুল নলেজ'-এর সঙ্গে। উদ্দেশ্য, জনশিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত করা, মানুষকে বিজ্ঞানসচেতন করা। তার জন্য লিখেছেন অ্যালজেব্রার বই, কাব্য-সঙ্কলন, গ্যালিলেয়ো ও কেপলারের মতো বিজ্ঞানীদের জীবনী। ভারতের মাটিতে পা রাখার আগেই এ দেশের শিক্ষার অগ্রগতি, সরকারি স্কুলের ছাত্রদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা পেয়েছিলেন তিনি। শিক্ষা সংসদের সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে খুঁজে নিলেন সমমনস্ক কিছু শিক্ষাব্রতী মানুষ, আর শিক্ষার প্রসারে সংযোজন করলেন তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা। শিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক রূপ, শিক্ষকদের আচরণবিধি, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা চর্চা, শিক্ষার্থীর উপযোগী বই লেখা, তাদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ, তাদের মেধার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কৃতিত্বের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা এবং সবার উপরে যোগ্য মানুষ হয়ে ওঠার দীক্ষা ইত্যাদি। ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আদর্শ শিক্ষাবিদের মতো বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— প্রকৃত শিক্ষা হৃদয় ও

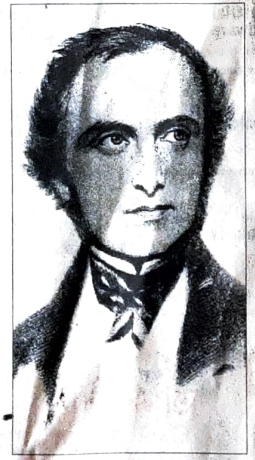

পথিকৃৎ: জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। ছবি: *উইকিমিডিয়া কমন্স*

ভালবাসার বোধকে শুদ্ধ করে তোলে, একই সঙ্গে বৌদ্ধিক শক্তির উন্নয়ন ঘটায়, নীচ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। ছাত্রদের উচিত সরকারি আনুকূল্যে শিক্ষা লাভ করার পর অর্থাৎ জ্ঞান পারিশ্রমিক মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো। এ ভাবেই এ দেশের চরিত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সম্ভব। বেথুন সাহেব ছাত্রদের বলতেন, ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য পাঠ করে রুচি ও শিক্ষা অনুযায়ী মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তরুণ ছাত্রদের বুঝিয়েছিলেন, তোমরা পারিবারিক সুখ উপলব্ধি করতে পারবে না, যদি না পরিবারের নারীটি বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা হয়।

কলকাতায় মেয়েদের স্কুল তৈরি করে অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেছিলেন, সেখানে কোনও রকম ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে না, মূলত মাতৃভাষায় পাঠ দেওয়া হবে। ইংরেজি-শিক্ষাও দেওয়া হবে প্রয়োজনে। দেশীয় সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু লেখাপড়া নয়, তাদের শেখানো হয়েছিল হাতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, এমব্রয়ডারি, ফ্যাশি আঁকাজোখা। যাতে মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে গৃহকর্মনিপুণ, যোগ্য দেবে সম্মানজনক কর্মবৃত্তে। বাংলা প্রদেশে শিক্ষার প্রসারের ভাবনায় যেমন প্রতিনিয়ত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতার কথা মাথায় রেখে কর্ম পরিকল্পনা করেছেন, ঠিক তেমনই ভেবেছেন শিক্ষার যথাযথ উপকরণ সরবরাহ করার কথা। প্রথমেই তাঁর মনে হয়েছে, বালিকাদের পাঠের উপযোগী বই কোথায়? প্রচলিত বইগুলি একাধিক ভাষায় পণ্ডিত বেথুন সাহেবের পছন্দ হল না। অভিভাবক-সভায় একটি 'বুক কমিটি'র প্রস্তাব করলেন, নতুন বই বা ভাল অনুবাদের বই লেখার জন্য। সহযোগিতার জন্য বেছে নিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর বাবু প্যারীচরণ মিত্র-সহ আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে।

বেথুনের শিক্ষাভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য— ভারতীয়দের মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য আগ্রহী করে তোলা। সে কালের হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তকে উপদেশ দিয়েছিলেন মাতৃভাষায় উন্নত সাহিত্য রচনায় নেতৃত্ব দিতে, যে ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি নিজস্ব সাহিত্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে তিনি বোধহয় হয়তো এই বেথুন সাহেবের অনুরোধটিকেই শিরোধার্য করেছিলেন।

বাংলার ঘরে ঘরে রুচিসম্মত সচিত্র বই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়েছিলেন বেথুন। কলকাতায় ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-বুক সোসাইটি উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর থেকে বেশ কিছু বাংলা বই প্রকাশ করলেও, তৃতীয়, চতুর্থ দশক থেকেই আর্থিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে সোসাইটির বই প্রকাশের কাজে ভাটা পড়ে। এ সময় বেথুনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' বা 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি'। এই সমিতি থেকে প্রকাশিত বইগুলিকে আকর্ষণীয় করার জন্য উচ্চমানের ছবি ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন বেথুন সাহেব। নিজে উদ্যোগ নিয়ে সেই সব ছবি সম্বলিত আর্ট-প্লেট, আনিয়ে সোসাইটিকে উপহার দিলেন। বাংলা বইয়ে এর আগে দেবদেবীর ছবি ছাড়া অন্য কোনও ছবি ব্লক করার প্রথা ছিল না। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'-এর মাধ্যমে বাঙালির নাগালে ভিন্ন স্বাদের বই এল। আবার একই সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটির সভাপতির পদে থেকে বাংলা পাঠ্যবই লেখার জন্যও লেখকদের উৎসাহিত করেছেন। বাঙালির মাতৃভাষা-চর্চায় তাই বেথুনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশাসনিক পদে থেকেও বেথুন কখনও বিস্মৃত হননি তাঁর ভালবাসার বিষয় গণিত। দিল্লির জনৈক শিক্ষক রামচন্দ্র মাথুরের কাছে থেকে তাঁর স্বরচিত একটি গাণিতের বই উপহার পেলে বেথুন। নাম "অ্যা ট্রিটিজ অন এ্যবলেমস অব ম্যাক্সিমা অ্যান্ড মিনিমা সল্‌ভড বাই অ্যালজেব্রা'। ইউরোপীয় ক্যালকুলাসের সাহায্য না নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় বীজগণিত অনুসারী এই বইটিকে কলকাতার ইউরোপীয় মহল শুরুত্ব না দিলেও বেথুন এটি দেখে মুগ্ধ হন, বইটির কয়েক কপি ইংল্যান্ডে পাঠান। সুপারিশ করেন বিশিষ্ট গণিতবিদ অ্যাস্টাস ডি মরগ্যানের কাছে। বেথুনের আগ্রহে রামচন্দ্রের প্রতিভা সারা ইউরোপে প্রচারিত হয়।

ছাত্রদের গণিতচর্চা, সাহিত্য ও মাতৃভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকেও তার নজর ছিল। ১৮৩৫ সালে, কলকাতায় প্রথম মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাথমিক স্তরে কলেজে অ্যানাটমি, সার্জারি পড়ানোর জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের প্রথা ছিল না। রক্ষণশীল সমাজের চোখ-রাঙানি উপেক্ষা করে ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের কাজটি যিনি করেন, তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। 'অ্যানাটমি' নামের এক মৌলিক গ্রন্থ রচনার সঙ্গে মধুসূদন গুপ্ত 'লন্ডন ফারমাকোপিয়া' নামের ইংরেজি বইটির বাংলা অনুবাদ করেন ১৮৪৯-এ। বেথুন ভারতে আসার পর এই প্রতিভাধর মানুষটির অবদান সম্বন্ধে অবহিত হলেন। এরই পরিণতি স্বরূপ মেডিক্যাল কলেজ ১৮৪৯ সালের ১৫ জুন উপহার পেল পর্তুগালের মাদাম বেলনসের আঁকা, মধুসূদন গুপ্তের একটি তৈলচিত্র, উচ্চতায় যা একটি মানুষের সমান।

শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও সঙ্কীর্ণতা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি বেথুন। ধর্মের ভিত্তিতে কলকাতার যে হিন্দু কলেজের উদ্ভব, সেখানে সব আর্থ-সামাজিক শ্রেণির ছাত্রের শিক্ষার অধিকার দিতে বাধ্য করেছিলেন তিনি। যেমন বাধ্য করেছিলেন মহীশূরে টিপু সুলতানের পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম জনগণের শিক্ষার অধিকার দিতে। একই ভাবে হিন্দু কলেজের উন্নত উদ্যমিক অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেবকে যোগ্য শিক্ষাও দিয়েছেন।

ভাবতে এসে নারীশিক্ষার প্রসারে বেথুনের অমানুষিক পরিশ্রম, উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখে অন্য সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজপুরুষরা তাঁকে উপহাস করতে ছাড়েননি। বেথুন চেয়েছিলেন মেয়েদের স্কুলের নামকরণে মহারানি ভিক্টোরিয়ার নামের সংযোগ থাকুক। সেই আবেদন তাঁর উপরওয়ালাদের পছন্দ হয়নি। নামের সংযোগ না হলেও বেথুন শিক্ষাবিদের মূল ধর্ম থেকে কখনও সরেননি। ১৮৫১ সালের ২৩ জানুয়ারি শিক্ষা দফতরের সভায় তাঁর নিজের মনের যে কথা ব্যক্ত করেছিলেন, সে কথাই চিরন্তন দেয় এক অনন্যসাধারণ শিক্ষাপ্রশাসককে, বলেছিলেন, "এ দেশে স্কুল স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য শুধু ভাল মুন্সেফ, ভাল গ্রাম্য হিসাব-পরীক্ষক, ভাল পুলিশ-রক্ষক অথবা অজস্র নিম্নমানের দেশীয় কর্মচারী তৈরি করে জনসেবায় সহায়তা করা নয়।"

এ দেশে এসে মানব-হিতৈষণার যে প্রবল মানসিক চাপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, এ দিকে নারীশিক্ষায় আন্তরিক উৎসাহ, অন্য দিকে আইনি অধ্যাদেশ সংক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিক পদক্ষেপ নিয়ে নেটিভদের প্রতি অবিচার বন্ধ করতে চেয়েছেন, সে সব চিহ্নিত হয়েছে কালা আইন নামে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, ভারতের প্রতিকূল আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছিল। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে, বহু অসমাপ্ত স্বপ্নকে পিছনে ফেলে তিনি পাড়ি দিলেন অন্য পৃথিবীতে।

মৃত্যুশয্যা থেকেও তাঁর স্বপ্নের স্বরূপটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বার বার আকুল অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা সরকারি শিক্ষা-প্রশাসক নন, এক মানবদরদি, নারীহিতৈষী কর্মপ্রাণ বিদেশি রাজপুরুষ, এ দেশে এসে যিনি আয়ের থেকেও এ কারণে ব্যয় বেশি করেছিলেন। ভারতের নারী-জাগরণের ইতিহাসের একটি সুদৃপ্রসারী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল বেথুন সাহেবের হাত ধরেই।

'রবিবাসরীয়' বিভাগে নিবন্ধ পাঠান। শব্দসংখ্যা ৮০০-১২০০। ইউনিকোড ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। পিডিএফ-এ নয়, ওয়ার্ড ফাইল ইমেল করুন।
ইমেল: rabi.article@abp.in
সাবজেক্ট: Rabibasariya Nibandha
পাণ্ডুলিপিতে ফোন নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা দেবেন।